Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.01-07
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মনোজ বসুর ছোটগল্পে দেশপ্রেম

সৌমেন মন্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Patriotic stories are among the stories Manoj Bose wrote based on the historical context of India's freedom struggle. Two types of patriotism are observed in these stories. One is the epitome of true patriotism, the other hypocritical. Through the stories of true patriotism, the author wants to show respect to the freedom fighters and inspire the countrymen to sacrifice themselves for freedom. On the contrary, through stories of hypocritical patriotism, the author unmasks the pseudo-patriots and warns the countrymen against them. Even after the independence of the country, there is an awareness in his story that true freedom remains elusive to the countrymen because of these pseudo-patriots. Also, some of the stories capture his valuable thoughts on the value of the freedom gained at the cost of many sacrifices.

Keywords: Independence, subjugation, patriotism, English, revolutionary.

বিশ শতকের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ে বাল্য-কৈশোর কাটিয়ে তিনের দশকে তিনি লেখক হিসেবে জীবন শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমকালে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের মতো পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হাহাকার নিয়ে ব্যর্থ জীবনের কোন ছবি আঁকেননি তিনি। 'কল্লোল'-এর নগরকেন্দ্রিকতা ও ভাঙন ধরা মূল্যবোধ থেকে দূরে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তিনি পদসঞ্চার করেছেন। যে সব বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন তার মধ্যে দেশপ্রেম অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা পর্ব অবলম্বনে তাঁর এই শ্রেণির গল্পগুলি রচিত। গল্পগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশভাগ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকালের প্রেক্ষাপট-আশ্রিত। ১৯২১-'৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনীতির সাথে লেখক সরাসরি যুক্ত ছিলেন। অহিংস আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি চরমপন্থীদের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহৎপ্রাণের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতি থেকে সরে এলেও দেশ ও কাল থেকে তিনি কখনোই চোখ ফিরিয়ে নেননি। ফলে দেশপ্রেম ও রাজনীতি তার সকল আসল-ঝুটা চেহারা নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা অবলম্বনে মনোজ বসু যে গল্পগুলি লিখেছেন সেগুলিতে দেশপ্রেম কীভাবে ধরা দিয়েছে তা সম্পর্কে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

মনোজ বসুর ছোটগল্পে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে আমরা প্রথমে তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গল্পটির কথা উল্লেখ করব। এই গল্পে মাটির প্রতি গহরের প্রেম স্বাদেশিক মাত্রা পেয়েছে। দেশ মানে যে নিছক কোনো ভূখণ্ড নয়, বরং সেই মাটিকে যারা সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা করে তাদের নিয়েই দেশভাবনার সামগ্রিকতা রচিত হয়। আলোচ্য গল্পে কৃষক গহর আলির মধ্যে এই ভাবনার এক উৎকৃষ্ট রূপ দেখা যায়। কঠিন শ্রমে সে বন্ধ্যা মাটিকে শস্যশ্যামলা আবাদে পরিণত করে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দেশের সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু জমিদার চাষীদের অন্ন ও স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে তাদের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে মাছ চাষ শুরু করলে ব্যর্থ আক্রোশে শত্রুপক্ষের ক্ষতি করতে গিয়ে গহর চোট পায় ও বিচারে তার জেল হয়। দু'বছর পরে যখন গহর জেল থেকে ছাড়া পায় তখন দেখা যায় সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। তবু সেই অন্ধ চোখেও সে দেশের পরিপূর্ণতা খোঁজে। লেখক লিখেছেন – "ও দেখছে-বড়-পুকুরে কাকের চোখের মতো জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে চোখে হাসি, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা।"[১] গহর মাটির মধ্য দিয়ে দেশকে চিনেছে, তাই মাটিকে ভালোবেসেই সে স্বদেশব্রত পালন করে। উল্লেখ্য, 'বন্দে মাতরম্' গান নিয়ে তৈরি হওয়া সমকালীন সাম্প্রদায়িক বিতর্ক সম্পর্কে মনোজ বসু সচেতন ছিলেন, তা এই গল্পপাঠে ধরা পড়ে। তিনি এই গানের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্মিলন চেয়েছিলেন, গহর তার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

পরাধীনতার বেদনা স্বাধীনচেতা ভারতীয়দের মনে যে আক্রোশের জন্ম দিয়েছিল মনোজ বসু 'এরোপ্লেন' গল্পের মণিলাল চরিত্রে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান চীনকে আক্রমণ করলে চীনের স্বাধীন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বদেশরক্ষায় অংশ নেয়। অন্যদিকে ভারতবাসী তখনও ঔপনিবেশিক শাসনে বন্দী। তাই ভারতের মাটিতে আধপাগলা চীনা ব্যবসায়ীকে দেখে মণিলাল আত্মগ্লানি বোধ করে – "নিজের দেশে ওরই বাপ-ভাই-বোন বন্দুক ঘাড়ে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে। নিজের দেশের মাটির উপর দম্ভ করে পা ফেলে বেড়ানো—কতকাল আমরা ভুলে গেছি। আমাদের সে ভাগ্যি নেই।"[২] তাই দাঁতে দাঁত চেপে স্বাধীনতার আশায় শত্রুর হয়ে ভারতীয়দের যুদ্ধ করতে হয় – "বাংলার যুবা প্রেম করছে না, কবিতা লিখছে না, ট্রেঞ্চের মধ্যে বিনিদ্র রাত্রি বসে কাটায়।"[৩] এই হতাশা থেকে দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-আগ্রাসনকে মণিলাল মেনে নিতে পারে না। তাই ভেঙে পড়া যুদ্ধবিমানের দিকে শিশুরা যখন খেলাচ্ছলে ক্রমাগত খোয়া ছুঁড়ে মারে তখন তার মনে হয় – "এরোপ্লেনে চড়ে দস্যিপনা করতে পারবে না, তখন অন্তত গুঁড়ো করে দিক তাকে। মাথার উপর দিয়ে উপহাস করে উড়ে যাবে, সে কিছুতে হবে না।"[৪] এই আক্রোশ স্বাধীনচেতা এক দেশপ্রেমীর।

দেশহিতৈষিণী এক মায়ের মনোবেদনার এক মর্মস্পর্শী রূপ উদঘাটিত হয়েছে 'মা' গল্পে। গল্পের কথক একজন স্বদেশি বিপ্লবী। ফেলে আসা ছাতা ফেরৎ নিতে এসে রায়বাহাদুরের স্ত্রীর মাতৃস্নেহে নিজের হারানো মাকে খুঁজে পান তিনি। তিনি বুঝতে পারেন স্বামী ইংরেজপোষ্য হলেও এই মাতৃতুল্য মহিলা দেশকে ভালোবাসেন। তাই কথকের মহৎ দেশপ্রেমের বিপরীতে নিজের স্বামীর স্বার্থপরতায় আত্মগ্লানি জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে। তাই স্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন – "তোমাদের মতো সোনার চাঁদদের নাস্তানাবুদ করা চাকরি ওঁর—আমাদের গায়ে তো রক্ত নেই, বিষ।"[৫] এই বেদনা থেকে নিজের সন্তানকে দেশভক্তির কঠিন পথে উৎসর্গ করতেও ভয় পান না তিনি – "তোমার কাছে একটু যদি যায় আসে, দুটো ভাল কথা শুনতে চায়—তাড়িয়ে দেবে বাবা দুয়োর থেকে?"[৬] দেশপ্রেমের মন্ত্রে এই মায়ের কাছে সন্তান ও বিপ্লবী এক হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার দাবিতে মানুষের দুর্মর সংগ্রামকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস লক্ষিত হয় 'দিল্লি চলো' গল্পের ঈশানের মধ্যে। গল্পনামে 'দিল্লি' শব্দটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন – "নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'দিল্লি' কথাটিতে এক আশ্চর্য মন্ত্রার্থ সমর্পণ করেছিলেন,...'দিল্লি' সেই বিশেষার্থে ছিল সর্বাত্মক জাতীয় মুক্তির প্রতীক।"[৭] গল্পে দেখা যায় সুভাষচন্দ্রের 'দিল্লি চলো' অভিযানের প্রেরণায় গ্রামের মানুষ সরকারি প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করতে স্থানীয় থানা দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে সমস্ত গ্রামবাসীর জরিমানা হয়। এই প্রেক্ষাপটে সন্তানহারা ঈশানের কাছে পুলিশ জরিমানা আদায় করতে এলে প্রাণ দিয়ে সে নিজের গোলার ধানকে রক্ষা করে নবজাতক শিশুর জন্য। তার স্বপ্ন – "এই ছেলে বড় হবে, দিল্লি বিজয় করবে। দিল্লি কত দূর?"[৮] বর্তমানের ত্যাগে ও আগামীর স্বপ্নে দিল্লি জয়ের প্রত্যয়ে এই আখ্যান সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

ধর্মীয় প্রথা অনুসারে এ দেশে মৃত্যুর পর হিন্দুদের শ্মশানে দাহ করা এবং মুসলমানদের কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে স্বাধীনতার থেকে বড় ধর্ম ছিল না। তাই স্বাধীনতার লড়াইয়ে শ্মশান-কবরের পার্থক্য করাও সবসময় সম্ভব ছিল না। 'কানু গাঙ্গুলির কবর' গল্পে এমনই এক বিশেষ ঘটনার কথা পাওয়া যায়। এই গল্পে স্বদেশের স্বার্থে শহিদ কানাই গাঙ্গুলির সৎকার প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা অনুসারে হয়নি। সাহেবপাড়ায় অর্থ লুঠ করতে গিয়ে কানাই গাঙ্গুলি শহিদ হন। দলীয় কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে রাত্রির অন্ধকারে সঙ্গীসাথীরা তাঁর মরদেহকে চটজলদি মাটিচাপা দেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে যে শ্মশান-কবরের পার্থক্য থাকে না তা বোঝাতে লেখক লিখেছেন –

> "হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের-কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে টাকাপয়সার বখরার হিসাব করে, তাদের। লড়াইয়ের মুখে জাতবেজাতের হিসাব থাকে না..."[৯]

এতদিন কানাইয়ের যে আত্মত্যাগের ইতিহাস কবরের মধ্যে গোপন ছিল স্বাধীন দেশবাসীকে সেই ইতিহাসের সাথে পরিচয় করান তাঁর সহযোদ্ধা শঙ্কর। যে সব অখ্যাতনামা সর্বত্যাগী রাজনৈতিক কর্মী জাতীয় ইতিহাসের অন্তরালেই থেকে যায় কানু গাঙ্গুলির কবর যেন তারই শরিক।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে ইংরেজ প্রশাসন চূড়ান্ত দমননীতি প্রয়োগ করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য দেশের মুক্তিযোদ্ধারা তাই ছদ্মবেশ গ্রহণ করত। 'আধুনিকা' গল্পে তেমনই এক মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশের নিপুণতা দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গল্পে উঠে এসেছে দেশপ্রেমীর বাহ্যিক ও অন্তরাল জীবনের দুই পৃথক রূপ। 'আধুনিকা' গল্পের লিলি মিত্তির ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের এক অন্তরাল নায়িকা। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠরতা কেতাদুরস্ত লিলি মিত্তির ধুলোভরা নোংরা পৃথিবীতে স্বস্তি পায় না। বেশভূষা ও নিখুঁত প্রসাধনে সহপাঠীদের কাছে সে যেন রীতিমতো জীবন্ত বিদেশি বিজ্ঞাপন। বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বাকি পৃথিবীর প্রতি সে করুণা বোধ করে। কিন্তু তার এই আধুনিকা রূপ নিতান্তই আত্মগোপনের কৌশল, আড়ালে সে পরাধীন দেশের এক মুক্তিযোদ্ধা। অগ্নিদগ্ধ সহবিপ্লবীর পুঁজরক্ত-ভরা বিকৃত ক্ষতের শুশ্রূষা করতে গিয়ে সবার অগোচরে সে যেমন যথার্থ সেবিকা হয়ে ওঠে, তেমনি সেই বিপ্লবীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পুলিশের গুপ্তচরের সাথে নিপুণ প্রেমের অভিনয়ে প্রকাশ্যে হয়ে ওঠে তুখোড় আধুনিকা। দেশপ্রেমের সুগোপন প্রকাশে এই 'আধুনিকা' সত্যিই অভিনব।

'চল গোয়া–' গল্পে জনৈক সত্যাগ্রহী যেভাবে অত্যাচার সহ্য করেছে তাতে বোঝা যায় দেশপ্রেমীর পথ কত দুর্গম। দেশপ্রেমী শুধু দেশের স্বাধীনতা নয়, দেশের অখন্ডতাও চায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও তখনও তার অঙ্গরাজ্য গোয়া পোর্তুগিজদের অধীন ছিল। এই অবস্থায় গোয়াকে পোর্তুগিজদের কবল থেকে মুক্ত করে তাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা তাই তাঁদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু গোয়া থেকে পোর্তুগিজদের বিতাড়ন করা সহজ ছিল না। তবু জীবন পণ করে দেশপ্রেমীরা সেদিন সেই দুঃসাধ্য কাজেই যোগ দিয়েছিলেন। আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে অখন্ড ভারতের স্বপ্ন নিয়ে দলে দলে ভারতীয় সত্যাগ্রহী গোয়া অভিযানে রত। গোয়ার সীমান্তে প্রবেশ করে এমনই এক সত্যাগ্রহী অসুস্থ অবস্থায় দলছাড়া হন। জ্বর, খিদে ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে করতে একসময় তিনি গোয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সত্যাগ্রহীদের গতিবিধি জানতে গোয়া পুলিশ তাঁর ওপরে দিনের পর দিন অকল্পনীয় শারীরিক অত্যাচার করলেও তিনি কিছুতেই দলীয় তথ্য ফাঁস করেন না। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে তারা তাঁকে পঙ্গু করে ছেড়ে দেয়। অসহনীয় অত্যাচারের মধ্যেও সত্যাগ্রহীর ঠোঁটে লেগে ছিল ঊর্ধ্বকন্ঠ জয়ধ্বনি – 'ভারত জিন্দাবাদ'। এইভাবে এই গল্পে দেশপ্রেমের তীব্র প্রকাশ দেখানো হয়েছে।

মনোজ বসু শুধু প্রকৃত দেশপ্রেমকেই দেখাননি, ভণ্ড দেশপ্রেমীদের কার্যকলাপকেও বেশ কিছু গল্পে চিহ্নিত করে রেখেছেন। 'জননী জন্মভূমিশ্চ' গল্পে জনতার অন্ধ ভক্তিতে জেলখাটা আসামি লোকনাথ যেভাবে দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচিত পেয়েছে তা বিস্ময়কর। ইংরেজ প্রশাসন স্বদেশি নেতা লোকনাথকে দুবার আইনের প্যাঁচে জব্দ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। জনতা ইংরেজ-নির্যাতিত লোকনাথকে সম্মান দিয়ে কর্পোরেশনে পাঠানোর প্রস্তাব আনলে স্ত্রী-হত্যার অভিযোগে তার দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়। ভক্ত-জনতা ভাবে সবই ইংরেজের ষড়যন্ত্র। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়, লোকনাথের প্রতি জনতার ভক্তিও বেড়ে ওঠে দ্বিগুণ – "আট বছর একটানা জেল-খেটে আসা মানুষ—যাঁরা মন্ত্রী হয়ে আছেন, তাঁদের যোগ্যতা কোন হিসাবে বেশি লোকনাথের চেয়ে?"[১০] তাই লোকনাথও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জনসভায় বক্তৃতা দেয় – "বন্দে মাতরম্—জননী ও জন্মভূমি একই দৃষ্টিতে দেখি আমরা। অসহ্য দুঃখদহনের পর অবশেষে মাতৃমুক্তি সম্ভব হল।"[১১] অথচ এই লোকনাথই চায়ে চিনি কম হওয়ার তুচ্ছ কারণে জনতার অগোচরে বৃদ্ধা মায়ের টুঁটি চেপে ধরে বলে – "বউ মেরে নেতা হয়েছি, তোমায় মেরে নির্ঘাত শহিদ হব এবার।"[১২] স্বীকারোক্তিপূর্ণ এই একটি মাত্র কথাতেই লোকনাথের আসল চরিত্র বেরিয়ে পড়ে। নিজের গর্ভধারিনী জননীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া স্ত্রীহন্তা অপরাধীর তথাকথিত দেশনেতা হয়ে ওঠার এই ছবি পাঠককে হতবাক করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী ভারতীয় কর্তৃক পরিস্থিতি বুঝে ভোল পাল্টানোর মুহূর্ত ধরা পড়েছে 'স্বাধীন ভারতে' গল্পে। পরাধীন ভারতে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ইংরেজঘেঁষা যে ভারতীয় উমেদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় কারাধ্যক্ষ হারান মজুমদার সেই শ্রেণিরই একজন। ইংরেজরা ক্ষমতা হারানোর পরে তিনি বিদেশি 'রায় সাহেব' উপাধি ত্যাগ করে স্বদেশি খদ্দর পরার কথা ভাবেন। এখানেই তাঁর দেশপ্রীতি শেষ হয় না, ইংরেজদের ওপর প্রতিশোধ নিতে মন্ত্রীর কাছে প্রমোশন চেয়ে তিনি বলেন – "দিয়ে দেখুন, আপনাদের ঠেঙিয়েছি—সাহেবগুলোকে কি করে ঠেঙাই এবার!"[১৩] হারানের মতো সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষের কাছে দেশপ্রেম কোনো স্বর্গীয় অনুভূতি নয়, স্বার্থসিদ্ধির উপলক্ষ্য মাত্র। স্বাধীন ভারতে হোক কিংবা পরাধীন ভারতে—এঁদের কখনো জাত বদলায় না।

অনুরূপ প্রেক্ষিতে 'রাজবন্দী' গল্পে জননেতা কুমুদ ও ইংরেজ কর্মচারী বিনোদের রূপান্তর ধরা পড়েছে। বিপ্লবী কুমুদকে শুভেচ্ছা জানাতে জেলখানায় নিয়মিত অজস্র দেশভক্তের সমাগম হয়। তাদের

কলোচ্ছ্বাসে বন্দিমুক্তির ভয়ে কারাধ্যক্ষ বিনোদ সমাদ্দার জেলের পাঁচিল উঁচু করে তোলেন। জনগণের আত্মদানে দেশ স্বাধীন হলে রাজবন্দী কুমুদ মন্ত্রী হন। অজস্র মানুষ নিজেদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে নিয়মিত ভিড় জমায়। কিন্তু সব দাবি পূরণ না হলে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। কুমুদও একসময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন - ''যত সব বজ্জাত লোক—নিচু পাঁচিল টপকে হয়তো বা কম্পাউন্ডের ভিতরই ঢুকে পড়বে।''[১৪] জনতার সাথে জননেতার সম্পর্কের অবনতি এখানে ধরা পড়ে। জনতার উপদ্রব ঠেকাতে পাঁচিলে কাঁটাতারের প্রয়োজন হলে কন্ট্রাক্টর রূপে এগিয়ে আসে ভূতপূর্ব সেই বিনোদ সমাদ্দার। তবে আজ তিনি আর ইংরেজ কর্মচারী নন, নব্য দেশভক্ত। জনতার মোহভঙ্গের বিপরীতে নেতা ও সুবিধাভোগী শ্রেণির ভোলবদলের এই ধারা আজও বাস্তব।

'গান্ধী টুপি' গল্পে বিপিন গান্ধী টুপি পরেও নিজের ভন্ডামিকে ঢাকতে পারেনি। ইংরেজের আইনরক্ষক বিপিন ও রতিপতির মতো পুলিশ অফিসাররা দেশের স্বাধীনতা আটকাতে স্বদেশি বিপ্লবীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করতে কোনো দিন পিছপা হয়নি। আবার দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে এই অফিসাররা অতি সহজেই বদলে নেয় নিজেদের পথ - "পুরাণো হাল-চাল বদলাতে হবে। যে বিয়ের যে মন্তোর!"[১৫] কিন্তু পদোন্নতির উদ্দেশ্য বদলায় না। ইংরেজের রাজদণ্ড এবার স্বদেশি নেতাদের হাতে, তা তারা জানে। তাই একদা যে ফেরারিকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে বিপিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, সেই নৃপেনকেই সংবর্ধনা জানিয়ে খুশি করতে বিপিন তার বাড়ি যায়। কিন্তু নৃপেনের সদ্যবিধবা স্ত্রী বিপিনের এতখানি চক্ষুলজ্জাহীনতা সহ্য করতে না পেরে বলে - "মাথা থেকে গান্ধীটুপিটা নামিয়ে ফেলুন। অত পাপ ঢাকা পড়বে না ঐটুকু টুপিতে।"[১৬] দেশপ্রেমের নামে আত্মগ্লানিহীন মানুষের গিরগিটি স্বভাবকে লেখক যে ক্ষমা করতে পারেননি তা বোঝা যায় এখানে।

'১৫ই আগস্ট' গল্পে শিক্ষক প্রিয়রঞ্জন দেশকে গভীরভাবে ভালবাসলেও স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারেননি। ইংরেজপোষ্য 'রায়বাহাদুর মহেন্দ্র' স্কুলের প্রেসিডেন্ট। এই স্কুলের স্বাধীনচেতা শিক্ষক প্রিয়রঞ্জন বঙ্গভঙ্গের পেক্ষাপটে ছাত্রদের স্বাদেশিকতার পাঠ দেন। অনুপ্রাণিত এক ছাত্র বঙ্গভঙ্গবিরোধী কার্যক্রমে মহেন্দ্রর হাতে রাখি বাঁধলে মহেন্দ্র স্কুলে পুলিশ ডাকেন। প্রিয়রঞ্জন ছেলেটিকে বাঁচাতে গেলে পুলিশ তাঁর মাথায় আঘাত করে ও মহেন্দ্র তাঁকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করেন। চল্লিশ বছর পরে দেশ স্বাধীন হলে মহেন্দ্র ভোল বদলে দেশভক্ত হন এবং স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে প্রিয়রঞ্জনকে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পঙ্গু জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া প্রিয়রঞ্জন তখন আর স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারেন না। তাই তাঁর আহতমস্তিষ্ক বক্তৃতায় ভন্ড মহেন্দ্রর সভা পন্ড হয়। দেশকে যিনি কখনো অন্তর থেকে ভালোবাসেননি, দেশের স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে সেই মহেন্দ্র যখন রাতারাতি দেশপ্রেমিক হয়ে আনন্দ উদযাপনে প্রস্তুত, তখন তারই বিপরীতে জীবনের খেই হারিয়ে ফেলা একজন প্রকৃত দেশপ্রেমীর স্বাধীনতা দিবসে এই আত্মবিস্মরণ **১৫ই** আগস্টকে বেদনাবিধুর করে তোলে।

দেশ স্বাধীন হলেও ভন্ড দেশপ্রেমীদের সক্রিয়তায় প্রকৃত স্বাধীনতার তাৎক্ষণিক স্বাদ থেকে সেদিন অনেকেই বঞ্চিত হয়েছিল। 'দিল্লি অনেক দূর' গল্পে তাই দেখা যায় দেশপ্রেমীদের রক্তমূল্যে অর্জিত সদ্যোজাত স্বাধীনতা দেশবাসীর মধ্যে দ্ব্যর্থ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজপোষিত শ্রেণির মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কা তৈরি করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তাই তারা দেশভক্ত হয়ে চিরশত্রু স্বদেশি বিপ্লবীদের সাথে দেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ উদযাপন করতে উন্মুখ হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত

স্বাদ তারা যেমন পায় না, তেমনি এই সুবিধাভোগী শ্রেণিশত্রুদের জন্য দেশের প্রকৃত স্বাধীনতাও অধরা থেকে যায়। গল্পে এদের সম্পর্কে সাবধান করে বলা হয়েছে – "এবারের লড়াই এই এদেরই সঙ্গে। আগে একটা সুবিধা ছিল, গায়ের রঙে জাত ধরা যেত। এবারে সেটা হবে না।"[১৭] অন্যদিকে দেশের সর্বহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির কাছে স্বাধীনতার বার্তা যখন এসে পৌঁছয় তখন স্বাধীনতার অর্থ তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় – "পবিত্র পতাকা শুধু এক রঙবেরঙের নেকড়ার ফালি ছাড়া কিছু নয়।"[১৮] যুগসঞ্চিত পরাধীনতার বঞ্চনা সাধারণ মানুষের মনে যে অসাড়তা সৃষ্টি করেছিল, স্বাধীনতার প্রথম দিন তাতে কোনো সাড়া ফেলতে পারেনি। খাতায়-কলমে দেশ স্বাধীন হলেও দেশবাসীর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা তখনও ছিল অনেক দূরে। গল্পনামেও এ কথা বলা হয়েছে।

'পতাকার নিচে' গল্পে মদন মাস্টার মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের মধ্যে যেভাবে স্বাধীনতার সার্থকতা খুঁজেছেন তাও দেশপ্রেমের নামান্তর। স্বাধীনচেতা, নির্লোভ, আদর্শবান মদন মাস্টার জীবনব্যাপী প্রাণপাতী শ্রমে অসংখ্য ছাত্র পড়িয়েছেন। কিন্তু স্বল্প বেতনের জন্য কোনোদিনই শিক্ষকতার প্রাপ্য সম্মান পাননি। তাঁর সততা ও আদর্শের ধ্বজা উত্তর প্রজন্ম বহন করেনি, এমনকি নিজের সন্তানরাও নয়। পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-পরিজনের আদর্শহীনতায় ক্ষুণ্ণ হয়ে তাদের ত্যাগ করে তিনি নিঃসঙ্গ হয়েছেন। বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর অন্নবস্ত্রের ন্যূনতম সংস্থানটুকুও হয় না। তবু জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করার অনুষ্ঠানে হতোদ্যম ন্যুব্জদেহ মদন মাস্টার আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ান। সূর্যালোকে বিভাসিত নিশানের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রার্থনা করেন, স্বাধীন ভারতের সৎ পরিশ্রমী সন্ততিদের পরিণতি যেন তাঁর মতো না হয়। জীবন বিকাশের সমস্ত সুযোগ পেয়ে প্রতিটি মানুষ যেন আত্মসম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারে, অর্থের লালসায় কেউ যেন আদর্শ না হারায় – "না হলে কিসের তবে স্বাধীনতা?"[১৯] অর্থাৎ, মদন মাস্টার মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের প্রেক্ষিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা খুঁজেছেন। নবীন প্রত্যাশায় তাই হতাশাক্লান্ত বোধ থেকে উঠে এসে পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি স্বাধীনতার সূর্যকে অভিনন্দিত করেছেন।

পরিশেষে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি মনোজ বসু ভারতের স্বাধীনতা পর্ব অবলম্বনে যে গল্পগুলি লিখেছেন তাতে দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। উপরোক্ত আলোচনায় তাঁর দেশপ্রেমভিত্তিক গল্পগুলিতে আমরা দুটি শ্রেণি লক্ষ করেছি। প্রথম শ্রেণিতে পেয়েছি 'মা', 'দিল্লি চলো', 'কানু গাঙ্গুলির কবর' ও 'আধুনিকা'র মতো গল্প এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ', 'স্বাধীন ভারতে', 'রাজবন্দী', 'গান্ধী টুপি' প্রভৃতি গল্প। প্রথম শ্রেণির গল্পগুলি প্রকৃত দেশপ্রেমের আদর্শস্বরূপ। এগুলির মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অন্য গল্পগুলি আদর্শচ্যুতি, স্বার্থলিপ্সা ও ভন্ডামির একশেষ। এগুলিতে বর্ণচোরা দেশপ্রেমীদের প্রতি দেশবাসীকে সচেতনতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'দিল্লি অনেক দূর' গল্পে স্বাধীনতার স্বাদহীনতা ও 'পতাকার নিচে' গল্পে মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশে স্বাধীনতার সার্থকতা সম্পর্কে লেখকের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে মনোজ বসুর স্বদেশচেতনার নানা দিক তাঁর গল্পে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ধরা পড়েছে।

তথ্যসূত্র:

1) ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৯৫।
2) তদেব, পৃষ্ঠা ৩০২।
3) তদেব।
4) পৃষ্ঠা ৩০৩।
5) মনোজ বসু, দিল্লি অনেক দূর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১।
6) তদেব, পৃষ্ঠা ১২।
7) ভূদেব চৌধুরী, ভূমিকা, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (মধ্য পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ১৪।
8) মনোজ বসু, দিল্লি অনেক দূর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১।
9) ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩১৬।
10) মনোজ বসু, খদ্যোত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৬১।
11) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৯।
12) পৃষ্ঠা ৬২।
13) পৃষ্ঠা ৮৫।
14) পৃষ্ঠা ৯৭।
15) পৃষ্ঠা ১০০।
16) পৃষ্ঠা ১০৩।
17) মনোজ বসু, দিল্লি অনেক দূর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৫।
18) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।
19) পৃষ্ঠা ৫২।